তারিখ ...2-6 DEC 1994...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী ঃএকটি সমস্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ

মাসুদা এ চৌধুরী

সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন ও জনসমাজের সমকালীন জীবন-চাহিদা পূরণে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নকে শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি, সাম্য ও জীবনের মান উন্নয়ন-এ তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার যথাযথ ভূমিকা উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে একদিকে যেমন দক্ষ, কর্মকুশল ও সৃষ্টিশীল জনশক্তি সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব, তেমনি সর্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে আয়ের বৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও সম্ভব। আবার শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মত মন-মানসিকতা সৃষ্টি করে। শিক্ষা যে শুধুমাত্র একটি সফল বিনিয়োগ তাই নয়, মানুষের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই যুগে যুগে শিক্ষা মানব সভ্যতার অগ্রগতি সাধনের সোপান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আর এ সত্যকে উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকার বিগত ২৩ বছরে শিক্ষা উন্নয়ন তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সর্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী তারই ফলশ্রুতি।

স্বাধীনতার পর সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শকের দায়িত্ব নেয়। ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার পরিমাণগত সম্প্রসারণ ও গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়। শিক্ষা খাতে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষার ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি করা যথা স্কুল নির্মাণ ও সংস্কার, আসবাবপত্র তৈরি, টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন এবং বিনামূল্যে বইপুস্তক সরবরাহ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে অবিভক্ত রেখে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ, সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগের মাধ্যমে ক্লাস্টার ও সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রমকে যোগ্যতাভিত্তিক, যুগোপযোগী ও জীবনভিত্তিক করারও প্রচেষ্টা নেয়া হয়। অধিকসংখ্যক মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের মাধ্যমে মেয়ে শিশুদের স্কুলে আগমনকে উৎসাহিত করা হয়, শিশু জরিপের মাধ্যমে স্কুল বহির্ভূত ও স্কুলত্যাগীদের তালিকাভুক্ত করে স্কুলে আনয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয় এবং অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারে শিশুদের স্কুলে আগমন এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে ''শিক্ষার জন্য খাদ্য'' কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। অপরদিকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও ব্যাপক গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাক্ষরতা অভিযান চালানো হচ্ছে। এসকল কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিকের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দ্রুত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো।

কিন্তু এতোসব আয়োজন সত্ত্বেও দেশে সাক্ষরতার হার আশানুরূপ পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই এ স্থবিরতার কারণসমূহ নির্ণয়ের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত বিগত নব্বই বছরের অগ্রগতির চিত্র বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ১৯০১ সালে বর্তমান বাংলাদেশের জনসংখ্যা যখন ছিল ১ কোটি ৯০ লাখ, সে সময়ে সাক্ষরতার হার ছিল ৫·৬ ভাগ। ৯০ বছর পর ১৯৯১ সালে আদমশুমারির তথ্য অনুসারে দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১১ কোটি ১৫ লাখের উর্ধ্বে; কিন্তু সাক্ষরতার হার মাত্র ২৪·৯৮। অর্থাৎ গত ৯০ বছরে মোট সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২০৮ ভাগ।

সাম্প্রতিককালের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ছিল (৬ থেকে ১০ বয়ঃক্রমের সকল শিশু) ১ কোটি ৭৩ লাখ। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এদের মধ্যে ১ কোটি ৩১ লাখ (৭৬৮) শিশুকে সে বছর স্কুলে ভর্তি করানো সম্ভব হয়েছে। বাকি ৪২ লাখ (২৪৮) শিশুকে আদৌ স্কুলে নেয়া সম্ভব হয়নি। ভর্তিকৃত এ শিশুদের মধ্যে আবার ৪৫ লাখ শিশু (৫৭৮) পাঁচ বছরের মেয়াদ সমাপনের পূর্বে স্কুল পরিত্যাগ করেছে। ফলে ভর্তি না হওয়া ও স্কুল পরিত্যাগকারীসহ মোট (৪২ লাখ+৭৫ লাখ) মৌলিক শিক্ষা-বঞ্চিতের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১ কোটি ১৭ লাখ (৬৮৮)। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিবছর মাত্র ৫৬ লাখ শিশু (৩২৮) পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে সক্ষম হয় বলে অনুমান করা যায়।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার (ইউনেসকো, ইউএনডিপি, ইউ-নিসেফ এবং বিশ্বব্যাংক) যৌথ উদ্যোগে প্রণীত সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সনদে স্বাক্ষর করেছে এবং ২০০০ সাল নাগাদ সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করেছে। শিক্ষার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ও আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে সাক্ষরতার দক্ষতা আয়ত্তকরণে উপানুষ্ঠানিক ধারার ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষার সকল উদ্যোগ ও কার্যক্রমকে সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ডিভিশন খোলা হয়েছে। কিন্তু এতসব আয়োজনের পরও যে সমস্যাগুলো থেকে যাচ্ছে তার সারাংশ মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মানব সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যের হারের তুলনায় অপ্রতুল। আবার এ অপ্রতুল বরাদ্দের বিরাট একটি অংশ (প্রায় ৩০ শতাংশ) আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার কারণে প্রতিবছর অব্যবহৃত থেকে যায়।

২। প্রাথমিক শিক্ষাকে পুরোপুরি জাতীয়করণ না করার ফলে গ্রামাঞ্চলের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার ন্যূনতম সুবিধা হতে বঞ্চিত। ফলে শিক্ষার মানও অপেক্ষাকৃত নিম্ন। আবার জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের বেতন-ভাতা ও বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়গুলোর ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়ার ফলে শিক্ষার পরিমাণগত দিকের উৎকর্ষতা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও গুণগত মানের তেমন কোন উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়নি।

৩। সুষম শিক্ষাব্যবস্থা না থাকায় সরকার ও সমাজের বিত্তশালী অংশের সক্রিয় প্রচেষ্টায় দেশে একটি বিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। এ বিভক্তি শহর-গ্রাম, সরকারি- বেসরকারি, সাধারণ ও বিশেষ বিদ্যালয়, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন পর্যায়ে বিরাজমান। আবার নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক বদলি, ভৌত সুযোগ-সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমতা সৃষ্টির পরিবর্তে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ সংবিধানে একটি সমান সুযোগসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

৪। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছেন না। এতে শিক্ষার গুণগত মান ব্যাহত হচ্ছে, যা প্রকারান্তরে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৫। আবার বিভিন্ন জাতীয় কার্যক্রমে যথা নির্বাচন, আদমশুমারি, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদিতে শিক্ষকদের ব্যস্ত রাখার দরুন বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষাদান কার্যের ব্যাঘাত ঘটে এবং স্কুলের কর্মঘন্টা অপচয় হয়।

৬। ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে মাসিক প্রশিক্ষণ, স্কুল পরিদর্শন ও শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের প্রচলনও দিন দিন কমে যাচ্ছে।

৭। অন্যদিকে আবার বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে গ্রাম অঞ্চলে ছাত্রসংখ্যার চাহিদার ভিত্তিতে অবকাঠামো নির্মাণের জরুরী কাজটি করা হয়নি। ফলে বর্ধিত সংখ্যার ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান দুষ্কর হয়ে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলে খোলা আকাশের নিচে আজকাল প্রায়ই শিশুশ্রেণীর ক্লাস বসে।

৮। মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় মহিলাদের অগ্রাধিকার না থাকায় অপেক্ষাকৃত ধনী ও শহরে মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে মহিলা শিক্ষিকার নিয়োগ ঘটেছে বেশি। তারা গ্রামাঞ্চলে কাজ করতে আগ্রহী নয়। ফলে শহরাঞ্চলে শিক্ষিকাদের বদলির ভিড় পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের স্কুলগুলোর শূন্যপদ প্রায়ই পূরণ করা হয় না।

৯। শিক্ষা উন্নয়নে সমাজের তথা স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের প্রচেষ্টাসমূহ (বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর হচ্ছে না। প্রায় ক্ষেত্রেই কমিটিগুলো নামসর্বস্ব।

১০। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত (ইনফেপ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এনজিও/সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম এলাকাভিত্তিক এবং সুনির্দিষ্ট পরিধি ও কাঠামোর মধ্যে না থাকায় একই শিশুকে নিয়ে দুই বা ততোধিক সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে।

১১। 'শিক্ষক ইউনিয়ন'-এর বাড়াবাড়ি, অন্যায় চাপ ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনকে প্রায় অচল করে রাখে। ফলে সময়মত সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

১২। দারিদ্র্যপীড়িত সমগ্র বাংলাদেশে শুধুমাত্র বিশেষ দরিদ্র এলাকার জন্য প্রবর্তিত 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর এলাকা নির্বাচন যেমন দুষ্কর তেমনি কর্মসূচী বহির্ভূত পার্শ্ববর্তী দরিদ্রপ্রধান স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সবার ওপর এ কর্মসূচী এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আবার পরিচালনায় দুর্নীতির কারণে ইতিমধ্যে কর্মসূচীটি বিভিন্ন সমালোচনারও সম্মুখীন হচ্ছে।

১৩। শিক্ষক, বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রশাসনকেন্দ্রিক সমস্যা ছাড়াও শিক্ষার অনগ্রসরতার পেছনে রয়েছে আরো কিছু কারণ, যেমন- সাক্ষরতা কর্মসূচীকে এদেশে এখন পর্যন্ত সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়নি। সরকার, বিরোধীদল কেউই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেনি; উপরন্তু বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট (অর্থ, প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ) শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর কোন দেশজ ভিত বা লাগসই অবকাঠামো সৃষ্টি না হওয়ায় যখন যে সরকার এসেছে তারা তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে সংগতি রেখে নতুনভাবে শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী সাজাতে চেষ্টা করেছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণেও বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা থাকেনি। ফলে অনেক কর্মসূচীই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি।

(বাকি অংশ আগামীকাল)